থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-25

Title: বাঙালির নন্দনসূত্র ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব

Author(s): Reza Mohammad Arif

DOI: 10.63698/Thespian.13.1.1801 || Published: 07 December 2025.

বাঙালির নন্দনসূত্র ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব © 2025 by Reza Mohammad Arif is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 13, Issue 25, 2025

Bengali New Bengali Edition
April-May

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Editorial Board

Chief Editor
Professor Abhijit Sen
Professor (retired), Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan

&

Editor of
Bengali New Year Edition 2025

Managing Editor
Dr. Bivash Bishnu Chowdhury
Researcher and Artiste

Associate Editors
Dr. Arnab Chatterjee
Assistant Professor of English,
Harishchandrapur College, Maldah, West Bengal

Dr. Tanmoy Putatunda
Assistant Professor of English,
School of Liberal Studies
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University
Bhubaneswar, Odisha

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বাঙালির নন্দনসূত্র ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব

রেজা মোহাম্মদ আরিফ, সহযোগী অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় ভক্তিবাদের পঞ্চম সূত্র 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদে'র অনুপ্রেরণায় 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' শিল্পতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। এ শিল্প মতবাদের প্রবক্তা সেলিম আল দীন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির বহুবিভাজন রীতিকে খারিজপূর্বক এমন এক মুক্ত আঙ্গিকের অন্বেষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে শিল্পের একাধিক আঙ্গিক একীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। শিল্পের বহুবিধ আঙ্গিককে এক উৎসকেন্দ্রে নিমগ্ন করে দেওয়া এ শিল্প মতবাদের উদ্দেশ্য। সেলিম আল দীনের মতে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব বাঙালির নিজস্ব শিল্পরীতি। সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা বাঙালির শিল্পসূত্রকে এ মতবাদের দ্বারা পুনরোদঘাটন করা হয়েছে।

Article History

Received **23 Oct. 2025**
Revised **03 Dec. 2025**
Accepted **04 Dec. 2025**

Keywords

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বাঙালির নন্দনসূত্র, ওড্রমাগধী, বর্ণনাত্মক বাংলা নাট্য, লীলানাট্য

'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বে' বাংলা নাট্যের প্রাচীনত্ব অনুসন্ধানের পাশাপাশি আঙ্গিক, গঠন-কাঠামো, দার্শনিক অভিপ্রায় এবং পরিবেশনারীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ও তাত্ত্বিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের (১৯৪৯ – ২০০৮) মতে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এমনই এক মুক্ত আঙ্গিক যার মধ্যে শিল্পের অপরাপর আঙ্গিকের স্থান লাভে কোন বাধা নেই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এই মতবাদে আধুনিককালে সংজ্ঞাভুক্ত নানা শিল্প মাধ্যমের কোন একটির আঙ্গিক ও রীতির পরিবর্তে, একটি মুক্ত আঙ্গিক গ্রহণ বা সৃজনের কথা বলা হচ্ছে। যার অর্থ সকল দ্বৈত শিল্পরীতিভেদ অস্বীকার পূর্বক রচনার কাঠামো, ভঙ্গি ও সর্বোপরি শিল্পের নানা উপাদানের একটি স্বতঃস্ফূর্ত মিশ্রণ যা সর্বাংশে মৌলিক এবং নানা রীতির সংযোগ সত্ত্বেও অভেদাত্ম" (আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ৯)। তাঁর মতে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব বাঙালির নিজস্ব শিল্পরীতি। সহস্র বছর ধরে বাঙালির শিল্পচিন্তায় যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, এই শিল্পতত্ত্বের ভেতর তার উদ্ভাসন ঘটেছে। এ শিল্প মতবাদের মাধ্যমে দেশজ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারজাত ও জাত্যাভিমানের মগ্নতায় গড়ে ওঠা বাঙালির শিল্পসূত্রকে পুনরোদঘাটন করা হয়েছে। কিন্তু সহস্র বছরের প্রাচীন শিল্পসূত্রকে নতুন করে পুনরোদঘাটনের প্রয়োজন পড়ল কেন? সেলিম আল দীন বলেছেন, ঔপনিবেশিক শাসন বাঙালিকে তার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার থেকে সচ্ছিন্ন করেছে। ঘটনাটিকে সেলিম আল দীন 'উপপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে,

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ঔপনিবেশিকতার প্রাবল্যে বাঙালির নিজস্ব শিল্পকলার প্রবহমান ধারাটি বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বাঙালির নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয়টি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। জাতিতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে এভাবে অকস্মাৎ উন্মুল হওয়ার পর্বটিকে সেলিম আল দীন 'মধ্যখণ্ডন' হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন –

> সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের শিল্প সৌন্দর্য বিচাররীতির ক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের প্রভাব হয়ে ওঠে নিরঙ্কুশ। ক্রমে কুড়িশতকে পাশ্চাত্যপ্রভাব অপ্রতিরোধ্য বলেই স্বীকৃত ও চর্চিত হয়ে আসছে। এর ফলে সহস্র বছরের শিল্পকর্মের যে দেশজ ধারাবাহিকতা আমরা দেখি তার বিচারের ক্ষেত্রে একটি অনপনেয় সঙ্কটের সৃজন হলো। [...] আমাদের শিল্পরুচির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এই মধ্যখণ্ডন নাটকের কতদূর ক্ষতি করেছে সে বিচারের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিলেও মর্মের অন্তরে এক বিষমচ্ছেদের কষ্ট পাই (আল দীন, *যৈবতী* ১৪০)।

সেলিম আল দীন পাশ্চাত্যের নন্দনসূত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের শিল্পসূত্র বাঙালির শিল্পকলা বিচারের জন্য অযথার্থ ও অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ সংস্কৃতি মাত্রই স্বভূমজাত এবং অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র। ভীনদেশী সংস্কৃতি এবং নন্দনতত্ত্বকে বাঙালির জন্য অনিবার্য বিবেচনা করার ঔপনিবেশিক প্রবণতাকে তিনি 'উপরচাপানো' আচরণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "পাশ্চাত্যের সংজ্ঞাভুক্ত শিল্পমাধ্যমসমূহ আমাদের দেশকাল ভূগোল-জনপদের বাস্তবতার সঙ্গে বাহিত শিল্পরুচির অনিবার্য সম্পর্ককে খণ্ডিত করেছে এবং একটি উপরচাপানো ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলেই এই খণ্ডন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের আদ্যন্ত জাতীয় শিল্পরুচির সঙ্গে তার একটা অমিলও আছে" (আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ৮)। পাশ্চাত্যের সাথে বাঙালির শিল্পরুচির অমিল কতখানি? সাধারণভাবেই ধারণা করা চলে, ইওরোপ এবং বাঙালির মনন প্রায় বিপরীতধর্মী। ইওরোপের মানুষ বাস্তববাদী, কর্মফলে বিশ্বাসী। অপর দিকে বাঙালি ভাববাদী ও প্রতীকপ্রিয়। ইওরোপের সমাজ কর্মমুখর। বাঙালির সমাজ কিঞ্চিত কর্মকুণ্ঠ। ইওরোপের মানুষ অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিবাদী অপরদিকে বাঙালি দেবোপম ও গুণময় শক্তির পূজারী।

ঔপনিবেশিক আগ্রাসন বাঙালির নন্দনভাবনা এমনকি সমৃদ্ধ জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাসকেও অগ্রাহ্য করেছে। অথচ পুরাতাত্ত্বিকদের মতে, এতদ অঞ্চলের সভ্যতার ইতিহাস ন্যূনতম পাঁচ হাজার বছরের। পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রাচীনত্ব প্রায় তিন হাজার বছরের অধিক (রায় ১১৫)। খ্রিষ্ট জন্মের ন্যূনতম হাজার বছর পূর্বে রাঢ় অঞ্চল একটি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থে গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্র জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর দু-তিনশো বছর পরে *অষ্টাধ্যায়ী*র টীকাকার পতঞ্জলির রচনায় অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যায়নের রচনায় অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র-এর উল্লেখ রয়েছে (শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা* ৩)। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ থেকে ২৯০ এর মধ্যে রচিত গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের *Indica,* খ্রিষ্টীয় প্রথম সালে গ্রিক লেখক দিওদোরাস রচিত *Biblotheca Historica*, দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে রচিত টলেমির *Geographia*, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে প্লুটার্ক রচিত *Parallel Lives*-সহ একাধিক গ্রন্থে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমন প্রসঙ্গে এক

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

হাজার অশ্বারোহী, সাতশত হস্তি এবং ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য সমৃদ্ধ গাঙ্গেয় তীরবর্তী গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডাই জাতির বিবরণ মেলে। আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ সালে। সে মতে, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই এ অঞ্চল মজবুত সামরিক শক্তি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপ লাভ করে। টলেমির *Geographia* গ্রন্থে সৌনাগড়া নামের যে সমৃদ্ধ জনপদটির উল্লেখ আছে তা প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম বা অধুনা সোনারগাঁ বলে গবেষকগণ ধারণা করেন। সৌনাগড়া সভ্যতার অংশ হিসাবে নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের বলে অনুমিত হয়েছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে যে তাম্রলিপ্তি নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তা আনুমানিক খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের। তাম্রলিপ্তির প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় এর পূর্বেই ঘটেছিল। গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১) মনে করেন অশোকের সময়, এমনকি গৌতম বুদ্ধের সময়ও তাম্রলিপ্তি ছিল এ অঞ্চলের প্রধান বন্দর। তবে তাম্রলিপ্তির চেয়েও প্রাচীন এক বন্দরের কথা জানা যায়। নাম পরস্থলী বা *Portalis*। রোমান ঐতিহাসিক *Plini*-এর লেখায় এর উল্লেখ আছে (শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা* ৩)। সিংহলী পালিগ্রন্থ *দীপবংশ* ও *মহাবংশে* বঙ্গদেশের যে গল্প আছে তা গৌরবের। গবেষকগণ সূত্রে জানা যায়, বিজয়সিংহ নামের এক বঙ্গরাজ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহল জয় করেছিলেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* ৩৭; রায় ১৮২)। সিংহল ছাড়াও লাড়দেশ জয় করে সীহপুর নামক নগরের পত্তন করেন। গবেষকগণের অনুমান, লাড়দেশ হলো প্রাচীন রাঢ় জনপদ এবং সীহপুর বা সিংহপুর হলো হুগলি জেলার সিঙ্গুর (রায় ১৮২)। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের (১৮৮৬—১৯৩০) গবেষণা মতে, প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে একজন বঙ্গদেশীয় বীরের পরিচয় মেলে। তার নাম লাক-লোঙ (Lak-long)। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে বন-লাঙ (Van-lang) দেশ থেকে দক্ষিণ ভারতের আনাম রাজ্য জয় করেন। নবলব্ধ রাজ্যের নামও রাখেন বন-লাঙ। বন বা বঙ নামে পরিচিত এই জাতি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনাম রাজ্য শাসন করে। মহাকবি কালিদাসের (আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক) *রঘুবংশ* মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দুর্ধর্ষ ও দক্ষ নৌশক্তির অধিকারী বঙ্গজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসকল বিবরণ এতদাঞ্চলের জাতিতাত্ত্বিক মহিমার গৌরবময় প্রকাশ।

প্রাচীনকাল থেকে অনার্য অধ্যুষিত এ অঞ্চলটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বিকশিত ও বিবর্ধিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আর্য সভ্যতা অনুপ্রবিষ্ট হলেও এ অঞ্চল নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার, ভাষা, পোশাক, সংস্কৃতিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেনি (মজুমদার ২২)। প্রাচীন কৃষিজীবি বাঙালি মানস বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বিমিশ্র উপলব্ধিতে বসুমতির উৎপাদন শক্তিকে নারীর প্রজনন ক্ষমতার সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। নারীত্বের উপর দেবত্বারোপ বাঙালি সংস্কৃতিজাত। দুর্গার শাকম্ভরী বা অন্নপূর্ণা রূপটি একান্তই বাঙালির (শরীফ, *বাউলতত্ত্ব* ১৪)। বিভিন্ন প্রাণী ও বৃক্ষের প্রতি দেবত্বারোপও বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজের অঙ্কুরোদগমনকে নর-নারীর মিলনসম্ভুত নবপ্রাণের জন্ম-রহস্যের সাথে মিলিয়ে দেখার মৈথুনতাত্ত্বিক প্রেরণা থেকে উদ্ভব হয়েছে প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব; যা সাংখ্যমতের সারকথা। যোগ এবং তন্ত্রেরও তাই। গবেষকের মতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র একান্তই বাঙলার ধর্ম (শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে* ৫৮)। জগতের রহস্যময়তা বাঙালির প্রাকৃত মনকে বিহ্বল করেছে। তুক-তাক, জাদু-টোনা, তাবিজ-কবজ, গ্রহ-নক্ষত্র, তিথি-দিনক্ষণ, শুভ-অশুভ প্রভৃতি অলৌকিক বিশ্বাস, আচার ও প্রতীক পরিপুষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে তন্ত্র ধর্মরূপে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বিকশিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিমা পূজা, মন্দির কেন্দ্রিক উপাসনা, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, ধ্যান, প্রেততত্ত্ব, ডাকিনী বিশ্বাস প্রভৃতি বাঙালির মনন ও দর্শন বাহিত হয়ে পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় হয়েছে। গুপ্ত শাসনামলে (৩২০ থেকে ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার তান্ত্রিক মতবাদ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তান্ত্রিক শৈবমত ও শাক্তমতের উন্মেষ ঘটায় (শরীফ, *বাউলতত্ত্ব* ১৪)। পাল শাসনামলে (৭৫০ থেকে ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ধর্মের সাথে তান্ত্রিক মতবাদের মিথস্ক্রিয়ায় বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযানসহ বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ ধর্মের যে বিশেষ অভিব্যক্তিটি আজকের মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় আদৃত হয়েছে, তা একান্তই বাঙালির। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক শৈবমত এবং বৌদ্ধধর্মের সহজযানের মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভব হয় বাংলার নাথধর্ম। ইসলাম আগমনের পর তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবে বাংলার সুফিবাদের উদ্ভব হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, শৈবধর্ম, নাথধর্ম, বাংলার সুফিবাদের মিলনে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম এবং তৎপরবর্তীকালে বাউলধর্মের উদ্ভব ঘটে। বাঙালির কৃত্যে, আচারে, উৎসবে এসকল মতবাদ ও দর্শন কাল পরম্পরায় বাঙালির নন্দনচিন্তা ও নিজস্ব নাট্যাঙ্গিকের স্বরূপ নির্মাণ করেছে।

বাঙালির নিজস্ব নাট্যরীতির সূত্র মেলে আচার্য ভরত প্রণীত *নাট্যশাস্ত্রে*। গ্রন্থটিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাটককে চারটি 'প্রবৃত্তি' বা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব ভারতের নাট্যরীতির নাম 'ওড্রমাগধী' (বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র ১১৮-১৯)। নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক। ফলে গবেষকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ন্যূনতম অষ্টম শতকের পূর্বে বাংলায় নাট্যের অস্তিত্ব ছিল (আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* ২)। সেলিম আল দীন ওড্রমাগধীকে প্রাচীন বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন (আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ* ৫৬)। তাঁর মতে, ওড্রমাগধী রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' যুক্ত অভিনয়। নৃত্ত শব্দটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'নৃত্য' এবং 'নৃত্ত' দুটো ভিন্ন আঙ্গিক। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে নৃত্য পরিবেশিত হয়। অপরদিকে নৃত্ত হলো ছন্দ ও তালযুক্ত সাধারণ অঙ্গভঙ্গি। অর্থাৎ ওড্রমাগধী হলো শাস্ত্রীয় ধারার বাইরে "জননন্দিত লৌকিক নাট্যাভিনয়"। তিনি বলেন, "প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশ- নেপাল- উড়িষ্যা- মিথিলা ও আসামের নাটক নৃত্যগীত ও কথার ত্রিসঙ্গমজাত শিল্পরীতি অর্থাৎ নৃত্ত। [...] ওড্রমাগধী রীতি নৃত্তের আশ্রয়ে পরিবেশিত হত। এর অর্থ- এই রীতি ছিল নৃত্য ও সংগীতে সাধারণী বা সহজিয়া রীতির" (আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ* ৫৬)। ওড্রমাগধী নাট্যরীতি ধ্রুপদী তাই সংস্কৃত নাট্যের মতো নয়; পাশ্চাত্যের ক্লাইমেক্স নির্ভর উক্তি-প্রত্যুক্তি সর্বস্ব নাটকের মতো তো নয়ই। কথা, নৃত্ত এবং গীতের অদ্বৈত উদ্ভাসনে এ নাট্যরীতি পরিবেশিত হয়। প্রাচীন বাংলার মৈথুনতত্ত্ব, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, শৈব-শাক্ত ধর্ম, তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদ, নাথপন্থাসহ বিচিত্র বিশ্বাস, ধর্ম-চেতনা, দর্শন, ধারণা, মতবাদ, তত্ত্ব প্রভৃতি ঘনীভূত হয়ে কৃত্য বা ধর্মাচারের আশ্রয়ে ওড্রমাগধীর স্বরূপ নির্মাণ করেছে। কখনো এই পরিবেশনার সাথে কাহিনি বা আখ্যান যুক্ত হয়েছে, কখনো শুধুই আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক তত্ত্বরূপে পরিবেশিত হয়েছে।

এ অঞ্চলের নাট্যের ইতিহাস *নাট্যশাস্ত্র* থেকে প্রাচীনতর। গবেষক স্টেন কনোর (১৮৬৭ - ১৯৪৮) *The Indian Drama* গ্রন্থে মগধ সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজা বিম্বিসারের (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫৮ থেকে ৪৯১) সম্মুখে বুদ্ধের বোধিত্বলাভের কাহিনিকে আশ্রয় করে 'বুদ্ধ নাটক' অভিনয়ের বিবরণ লভ্য (Konow 80)। বিবরণ মতে, দক্ষিণাপথ থেকে দলবলসহ একজন আচার্য এসে বুদ্ধ নাটকের

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

অভিনয় করেন। অনুমান করা যায়, আচার্য এবং নটগণ পেশাদার অভিনেতা ছিলেন। বিবরণটি সত্যি হলে এ অঞ্চলে নাটকের ইতিহাস সংস্কৃত নাটক থেকে কমপক্ষে প্রায় পাঁচশত বছর প্রাচীন। এমনকি গ্রিক ট্র্যাজেডির জনক এস্কাইলাসের (৫২৫ থেকে ৪৫৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) চেয়েও প্রাচীনতর। বুদ্ধ নাটক হলো নৃত্য-গীত বহুল ওড্রমাগধী রীতির বৈশিষ্ট্যানুবর্তী নাট্যাঙ্গিক (আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* ৪; রায় ৫৮০; মজুমদার ৪২)। এ ঘটনার প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও বুদ্ধ নাটকের অস্তিমানতার খবর পাওয়া যায়। চর্যাপদের কবি বীণাপা (খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দশম শতকের শেষার্ধ) রচিত সতের নম্বর চর্যায় বুদ্ধ নাটক পরিবেশনের বিবরণ লভ্য[১] (সেন ৬৭-৮)। চর্যাপদ হলো বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের গূঢ়ার্থমূলক সাধনগীতি। মূলত পরিবেশনার জন্য চর্যা রচিত হয়েছিল। গবেষকগণের মতে, নৃত্য, গীত, তত্ত্বালাপযোগে চর্যাকর কর্তৃক তা পরিবেশিত হতো। চর্যার এই পরিবেশনা নিশ্চিতরূপেই ওড্রমাগধী নাট্যরীতির অনুবর্তী (আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ১৪)। চর্যার কবিগণের কেউ কেউ পেশাজীবি নট ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কাহ্নপা রচিত দশম সংখ্যক চর্যায়[২] ব্যবহৃত 'নাড়পেড়া' শব্দটিকে গবেষকগণ 'নটগিরি' বা 'নটপেটিকা' বা 'নটের সাজ-পোশাক বহনকারী পেটিকা' অর্থে গ্রহণ করেছেন। ফলে অনুমানে বাধা নেই যে, কাহ্নপার (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক) সময়কালে পেশাজীবী নটের অস্তিত্ব ছিল। চর্যা পরবর্তীকালেও বাংলায় পেশাদার নটের অস্তিত্ব মেলে। বিদ্যাপতি রচিত *পুরুষ পরীক্ষা* গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের (রাজত্বকাল ১১৭৮ - ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) মন্ত্রী উমাপতির সাথে একজন নটের বিরোধের বিবরণ পাওয়া যায় (সান্যাল ৩৩)। এছাড়া আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে বাংলা অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ* এবং পরবর্তীকালের *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* সমাজের নিম্নস্তরে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে নটের উল্লেখ মেলে। চর্যাপদ পরবর্তী লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব কর্তৃক দ্বাদশ শতকে রচিত *গীতগোবিন্দ*, প্রাক-চৈতন্য যুগের বড়ু চণ্ডিদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬ - ১৫৩৪) অভিনীত লীলানাট্য, মধ্যযুগের নাথগীতিকা, মঙ্গলকাব্যসহ উনিশ শতকের 'মধ্যখণ্ডন' অবধি বাঙালির সকল পরিবেশনা ওড্রমাগধী রীতির অনুগামী। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জীবন ও জগৎ জিজ্ঞাসা, ধর্ম-চেতনা, আধ্যাত্মবাদ, নন্দনভাবনা, দর্শন-বিশ্বাস, আচার-কৃত্য বাহিত ওড্রমাগধী নাট্যরীতির মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সূত্র নিহিত আছে। সেলিম আল দীন বলেন, "প্রাকবুদ্ধকাল, চর্যাপদ ও উত্তর কাল থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলা গান, নাট্যপালা, উপাখ্যান, চিত্রকলা, ভাস্কর্য - এমনকি এদেশে প্রচলিত নানা ধর্মদর্শনের মধ্যে একটি পারস্পরিক সাধারণীকৃত নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্য অনুধাবন করা যায়। [...] এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানান শিল্পমাধ্যমে সমাজ-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবিচারের একটি সাধারণ সূত্র ছিল" (আল দীন, *যৈবতী* ১৪০)। ফলে ইউক্রেনিয়ান লেবেদেফের হাত ধরে অষ্টাদশ শতকের শেষে ব্রিটিশ কোলকাতায় বাংলা নাটকের সূত্রপাত— এই ঔপনিবেশিক ন্যারেটিভের বিরুদ্ধে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অবস্থান করে। যে সকল সূত্র এবং তত্ত্ব দ্বারা ঔপনিবেশিক মনন নাটকের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ নির্ধারণ করে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তা খণ্ডন করে। পাশ্চাত্য নাটকের সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং আঁটোসাঁটো গড়নকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যান করে। ত্রি-ঐক্য নির্ভর একক বৃত্তাশ্রয়ী ধ্রুপদী গ্রিক ট্র্যাজিডি, রেঁনেসাসের মানবীয় ত্রুটি ও কর্মফল নির্ভর পঞ্চাঙ্করীতি, ড্রয়িংরুমে বন্দি রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজমের বদলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সামগ্রিক জীবনের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষার অন্বেষী। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাই পাশ্চাত্যের 'স্লাইস অফ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

লাইফ' তত্ত্ব বর্জন করে। ওড্রমাগধীয় বুদ্ধ নাটক গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভের কাহিনিকে উপজীব্য করে তাঁর সামগ্রিক জীবনের যে কথা বলে; চর্যাপদে আধ্যাত্বিকতার যে গূঢ়তত্ত্ব পরিবেশিত হয়; কথা আর গীতের ছলে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* অলৌকিক কৃষ্ণের যে লৌকিক জীবনের সামগ্রিকতাকে ব্যঞ্জিত করে; আট দিনব্যাপী পরিবেশিত মঙ্গলকাব্য পশ্চিমা নাট্যের যে অঙ্গিক-সংকীর্ণতাকে চ্যালেঞ্জ করে; শ্রীচৈতন্যের লীলানাট্যে ভক্তি মথিত নিবেদনে অসংখ্য দেবোপম রূপের যে অদ্বৈত উদ্ভাসন ঘটে; বাঙালির জীবন, বীক্ষণ, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা সঞ্জাত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সেসকল মহাকাব্যিক সুরের অন্বেষণ করে। বার্টল্ট ব্রেখটের 'এপিক থিয়েটার' পাশ্চাত্যের আঙ্গিক-সংকীর্তাকে অগ্রাহ্য করেছে বটে, কিন্তু সেলিম আল দীনের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরিসর আরো বৃহত্তর, আরো বৈচিত্র্যময়। তাঁর নাটকের প্রেক্ষাপট সুবিস্তৃত, অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রবহুল, সংলাপ ও বর্ণনার তীব্র মাখামাখি, নাটকের গড়ন উপন্যাসের মতো, ভাষারীতি গদ্য এবং পদ্য মথিত, গদ্য আবার কাব্যময়। আখ্যান, উপকাহিনি, সংলাপ, বর্ণনা, গীত, গদ্য, পদ্য প্রভৃতির সমারোহে বিচিত্রগন্ধী। তিনি বলেছেন, তাঁর নাটক একই সাথে উপন্যাস, কাব্য, নাটক বা আখ্যান। একাধিক স্বতন্ত্র আঙ্গিক এভাবে একসাথে ব্যঞ্জিত হয় বলে এ শিল্প মতবাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করেছেন।

ইওরোপীয় মনন জীবনকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার প্রয়াসী। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে স্বতন্ত্রভাবে দেখার ফলে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় বটে, কিন্তু একক প্রত্যক্ষণে জীবনের সামগ্রিকতাটি অধরা থেকে যায়। ইওরোপের শিল্পসূত্র একান্ত সুনির্দিষ্ট ও বিষয় কেন্দ্রিক। এই কেন্দ্রাভিমুখীতা শিল্পের অপরাপর উপাদানগুলোকে কঠোরভাবে পরিত্যাগ করে। সেলিম আল দীন মনে করেন— কঠোর নিয়ম ও অনুশাসন নির্ভর পাশ্চাত্য আঙ্গিকের বিরুদ্ধে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একপ্রকার মুক্তির আহবান এবং এই মুক্তির বারতা নিহিত আছে ওড্রমাগধী তথা বাংলা নাট্যের প্রবহমান ধারায়। তাঁর মতে, "নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ— তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকেই অবলম্বন পূর্বক আসর থেকে আসরে ঘুরেছে নেউরালঙ্কারে" (আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ১০)। ট্র্যাজিডি, কমেডি, ফার্স, মেলোড্রামা, একাঙ্কিকা, পঞ্চাঙ্ক রীতি, বিভিন্ন ইজমধর্মী নাটকসহ পাশ্চাত্য নাটকের ইত্যকার বিভাজনকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খারিজ করে। অর্থাৎ এই মতবাদের অবস্থান পাশ্চাত্যের বহু-বিভাজন রীতির বিরুদ্ধে। এর ফলে একটি বিতর্কের জন্ম হয়েছে। সমালোচকরা বলেন যে, শিল্পের বিভাজন না মানলে বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয়। বৈচিত্র্য আছে বলেই জগত সুন্দর ও বিস্ময় জাগানিয়া। এর উত্তরে সেলিম আল দীন বলেন, "'পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রবলতা' সেখানকার সাহিত্যের শ্রেণীভেদ বা শ্রেণীবৈচিত্রের সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী নন্দনতাত্ত্বিক সংজ্ঞাসূত্র 'শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা কৃত্রিম নৈয়ায়িক ব্যবস্থা' এবং তা শিল্পের ক্ষেত্রে বিচিত্রতার আস্বাদ দিলেও 'শিল্পের কেন্দ্রীভূত রূপটিকে খানিকটা উৎকেন্দ্রিক' করে ফেলে" (আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ৮-৯)। অর্থাৎ সেলিম আল দীন শিল্পের কেন্দ্রীভূত রূপের অন্বেষী। তবে এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের গূঢ়ার্থটি গৃহিত হয়েছে, ভারতীয় ভক্তিবাদের পঞ্চম সূত্র শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬ - ১৫৩৪) 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ' থেকে। চৈতন্যের দর্শন মতে, পরামাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

আছে; তেমনই সকল জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। ঈশ্বর এবং জীব তাই অদ্বৈত, আবার প্রত্যেকে নিজস্ব সত্তায় স্বতন্ত্র বলে পরস্পর থেকে ভিন্ন বা দ্বৈত। যেমন সমুদ্র এবং ঢেউ— পরস্পর ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। এই সম্পর্কটি সাধারণদৃষ্টে অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর বলে এর নাম অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

শঙ্করাচার্যের (৭৭৮—৮২০) জ্ঞানমার্গী দর্শনের প্রতিভাষ্য হিসেবে ভারতীয় ভক্তিবাদের উদ্ভব। শঙ্করের দর্শনের নাম 'অদ্বৈতবাদ'। অষ্টম শতকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের (৭১১ খ্রিষ্টাব্দ) পর ইসলাম ধর্মের জাত-বর্ণ-বর্গ নিরপেক্ষ চেতনার প্রতি ভারতবর্ষের নিপীড়িত নিম্নবর্গসহ উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও আকৃষ্ট হয়েছিল (শরীফ, "চৈতন্য মতবাদ" ১৬৫)। সেদিনের ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ইসলাম বর্ণিত স্রষ্টার ধারণা দিয়েই প্রতিহত করেছিলেন বত্রিশ বছরের যুবক শঙ্করাচার্য (ঘোষ ১২১-২৪)। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ইসলাম ধর্মের মতো একক ও নিরাকার ঈশ্বরের অন্বেষী। তবে ইসলাম ধর্মে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি স্বতন্ত্র। আল্লাহ মালিক আর জীব হলো মাখলুকাত। কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতবাদে স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি ভিন্ন নয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং জগৎ বা জীবাত্মা এক বা অদ্বৈত। সৃষ্টিতত্ত্বের এই ধারণা শঙ্কর গ্রহণ করেছিলেন উপনিষদ থেকে। উপনিষদের "একম এব অদ্বিতীয়ম" ব্রহ্মার ধারণা থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদে তার চর্চা ছিল না। *বৃহদারণ্যক* উপনিষদে আছে, "ব্রহ্ম ইদম্গ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" (১/৪/১০); অর্থাৎ "এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই বর্তমান ছিল। তিনি নিজেকে 'আমি ব্রহ্ম' রূপ জেনেছিল"। *মাণ্ডুক্য* উপনিষদে আছে, "সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম"; অর্থাৎ "এই সকলই ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম।" *ছান্দোগ্য* উপনিষদে আছে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; অর্থাৎ "সবকিছুই ব্রহ্ম"। (কৃষ্ণ দাস ৫২)। অদ্বৈত দর্শন মতে, ব্রহ্মই সত্য। আর সব মিথ্যা, মায়া, প্রপঞ্চময়, প্রতিভাসিক। তাই এ দর্শনটিকে মায়াবাদী দর্শন বলা হয়। এ দর্শন মতে দৃশ্যমান জগৎ মায়া বা মিথ্যা। তবে মিথ্যা বা মায়া অর্থ অস্তিত্বহীন নয়; এর অর্থ আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল ও পরিণামী। একই জগৎ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করে। মরুভূমি এবং সাগরের আবেদন এক নয়। একই জগৎ আবার ঋতুভেদে স্বতন্ত্র। আবার একই জগৎ আলাদা আলাদা মানুষের কাছে স্বতন্ত্র আবেদনসম্ভূত। আবার মানুষের কাছে জগতের যে আবেদন, অন্যান্য জীবের কাছে তেমন নয়। মায়ারূপ জগৎকে বোঝাতে শঙ্কর সাপ এবং রজ্জুর উদাহরণ দিয়েছেন। রজ্জুকে সাপ ভেবে ভ্রম হলেও স্বর্প দর্শনের অনুভূতি দ্বারা মানুষ ঠিকই আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই বিভ্রম কেটে গেলে রজ্জুকে রজ্জুই মনে হয়। রজ্জু এবং সাপের মতোই অজ্ঞানতাবশত ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভ্রম হয়। এই অজ্ঞানতা দূর করার জন্য বিবেকের জাগরণ প্রয়োজন (কৃষ্ণ দাস ৫২)। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের ধ্বংস বা সৃষ্টি নেই। ব্রহ্ম হলেন অনাদি, অসীম, অনন্ত, নিরাকার ও অপরিণামী (কৃষ্ণ দাস ৫৩)। এ মতামত শঙ্করের নিজস্ব নয়, উপনিষদপ্রসূত। কিন্তু এরপর যা বলেছেন, তা ইতোপূর্বে আর কেউ বলেননি। শঙ্করের মতে, এই জগৎ ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টির জন্য উপকরণের প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম নিরাকার, চৈতন্যময় এবং অপরিণামী। কিন্তু উপাদান বা উপকরণ হলো আকারযুক্ত, জড় ও পরিণামী। নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে আকারযুক্ত উপাদানের অস্তিত্ব অসম্ভব। ব্রহ্মের যেহেতু কোন উপাদান নেই, তাই কোনকিছু সৃষ্টিও হয়নি। শুধু মায়া বা ভ্রমবশে আমরা দৃশ্যমান জগৎকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিজগৎ বলে মনে করি। দর্পনের বা হ্রদের জলের প্রতিবিম্বকে যেমন ভ্রমবশত সত্য বলে মনে করি। যতক্ষণ মায়া থাকবে ততক্ষণ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

জগৎকে সত্য বলে ভ্রম হবে (কৃষ্ণ দাস ৫৩)। অদ্বৈত দর্শনে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভিন্ন। জীবাত্মা তাই মুক্ত বা বন্ধনহীন। যেহেতু জীবাত্মা মুক্ত, তাই তার মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত জীবাত্মা মুক্তির জন্য জীবনের বৃথা অপচয় করে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটলে তবেই সত্যিকারের মুক্তি মেলে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনই হলো জ্ঞান। এ কারণে শঙ্করের দর্শনকে 'জ্ঞানমার্গী' দর্শনও বলা হয় (কৃষ্ণ দাস ৫৪)। জ্ঞানের মাধ্যমেই মায়ার ধারণা বিদূরিত হয়। মায়ার ধারণা বিদূরিত হলে বিষয়চিন্তা দূর হয়। বিষয়চিন্তা বিদূরিত হলে কর্ম হয় নিষ্কামকর্ম। নিষ্কামকর্মে নিবিষ্ট জীবের বাসনা ক্ষয় হয়। বাসনা ক্ষয় হলে মোক্ষ বা মুক্তি ঘটে।

শঙ্করের দর্শন শাস্ত্রদ্রোহী। অদ্বৈতবাদীগণ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসে উৎসাহী ছিলেন। পৌত্তলিকতা, দেববিশ্বাস, দেবপূজা, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতিকে অস্বীকারপূর্বক জ্ঞানমার্গীয় সাধনায় নিজেদের নিমগ্ন করেছিলেন (শরীফ, "চৈতন্য মতবাদ" ১৬৬)। বৌদ্ধগণের নির্বাণ লাভের মতোই জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের মাধ্যমে শঙ্কর ছিলেন মোক্ষ লাভের প্রয়াসী। অসংখ্য বৌদ্ধ শঙ্করের অদ্বৈতবাদে আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম ত্যাগ করেন। ফলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ একই সাথে ইসলাম প্রতিরোধ, বৌদ্ধ বিলোপের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের ভাঙন রোধ করে।

শঙ্করের দর্শনে ভক্তির যোগ নেই। শঙ্করের জ্ঞানমার্গী দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় ভক্তিবাদের প্রথম সূত্রের নাম 'বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ'। এর প্রবক্তা রামানুজাচার্য (১০১৭ - ১১৩৭)। রামানুজের সময় থেকে জ্ঞানের বদলে ভক্তিকে আশ্রয় করে মানব-মুক্তির সন্ধান করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, উপনিষদ, *মহাভারতে*র নারায়ণীয় অংশ প্রভৃতি থেকে রামানুজ ভক্তির প্রসঙ্গসমূহকে সূত্রাবদ্ধ করেন। ভক্তির সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রথম উল্লেখ আছে, *শ্বেতাশ্বতর* উপনিষদের শেষ শ্লোকে। সেখানে বলা হয়েছে—

যস্যদেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ\ (৬/২৩)

অর্থাৎ— ঈশ্বর এবং গুরুর প্রতি যার অবিচল ভক্তি আছে তিনিই যথার্থ মহাত্মা। এরকম অধিকারীর মনেই সত্যের স্বরূপ সর্বদা উন্মোচিত হয় (লোকেশ্বরানন্দ ৭০৭)।

আবার *শ্রীমদ্ভগবতে* উল্লেখ আছে যে,

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে\ (১/২/১১)

অর্থাৎ— যা অদ্বয় জ্ঞান, তাকেই তত্ত্ব জ্ঞানীরা (পরম) তত্ত্ব বলেছেন, সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে কল্পিত হয়ে থাকেন (রাইন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব" ২৭৮)।

উল্লিখিত শ্লোকের মর্মার্থ হলো তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে যিনি ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তু; যোগীর নিকট তিনি পরমাত্মা; তিনিই ভক্তের নিকট ভগবান (রাইন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব" ২৭১)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কিন্তু ব্রহ্ম এবং জগৎ এক নয় আবার পৃথকও

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

নয়। ব্রহ্ম এবং জগৎ এক নয় কারণ এ জগৎ ব্রহ্মের পরিবর্তিত রূপ। ব্রহ্মের মাঝে পরিণামী এবং অপরিণামী অংশ রয়েছে। ব্রহ্মের পরিণামী অংশের রূপান্তর থেকে জগতের উৎপত্তি ঘটেছে। আবার জগৎ এবং ব্রহ্ম ভিন্নও নয়। কারণ ব্রহ্ম থেকেই জগতের উৎপত্তি। এ সম্পর্কটির ব্যাখ্যায় *মাণ্ডুক্য* উপনিষদে বলা হয়েছে যে, মাকড়সার শরীর থেকে তন্তু উৎপন্ন হলেও তন্তুকে যেমন মাকড়সা বলা যায় না আবার মাকড়সা থেকে আলাদাও করা যায় না; ব্রহ্ম এবং জগতের সম্পর্ক অনেকটা এরূপ (কৃষ্ণ দাস ৫৪)। রামানুজের মতে, জগৎ তাই কোনমতেই মিথ্যা বা প্রতিভাসিক নয়। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজেই জগৎ হয়েছেন। জগৎ হলো ব্রহ্মের পরিণাম, তাই ব্রহ্ম জগৎ নন। দুগ্ধ থেকে যেমন দধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুগ্ধ কখনো দধি নয়। জগৎকে রামানুজ ব্রহ্মের দেহের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু জগৎ নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। জগতের মৃত্যু-ধ্বংস-ক্ষয় আছে। ব্রহ্মের দেহের যদি ক্ষয় হয়, ব্রহ্মেরও কি ক্ষয় বা ধ্বংস আছে? রামানুজ বলেন, জগৎ যদি দেহ হয় ব্রহ্ম তবে আত্মা। আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। জগতের পরিবর্তন হলেও ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম দ্বিভাগ যুক্ত। ব্যক্ত ভাব এবং অব্যক্ত ভাব। দৃশ্যমান জগৎ ব্যক্ত ভাবের অংশ; আর অব্যক্তভাবে ব্রহ্ম নিরাকার, অসীম, অনন্ত ও নির্গুণ। ব্রহ্মের অব্যক্তভাবকেই বলা হয় পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। অগ্নি যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ কণার সমষ্টি, পরমাত্মাও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাত্মার সমষ্টি। জীবাত্মা সসীম কিন্তু পরমাত্মা অসীম। জীবাত্মা ও ব্রহ্ম তাই অভিন্ন নয়। আবার জীবাত্মা যেহেতু ব্রহ্মের ক্ষুদ্র অংশ, তাই ব্রহ্ম ও জীবাত্মা ভিন্নও নয়। এই তত্ত্বের কারণে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র অপর নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। রামানুজের মতে, অবিদ্যার জন্য আত্মার বন্ধন হয়। ফলে পুনর্জন্ম ও কর্মফল ভোগ করতে হয়। আত্মার মধ্যে ভক্তির উন্মেষ ঘটলে অবিদ্যা দূর হয়। ভক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মের কৃপা লাভ সম্ভব। জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়ে ঘটে মোক্ষলাভ (কৃষ্ণ দাস ৫৫-৬)।

আচার্য নিম্বার্কের (১১৩০ - ১২০০ আনু.) মতবাদের নাম 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'। এ মতবাদের সাথে রামানুজ দর্শনের ঐক্য রয়েছে। নিম্বার্কের মতে, ব্রহ্ম একই সাথে ভেদ ও অভেদ। রামানুজের ন্যায় নিম্বার্কও জীবাত্মাকে স্বরূপত চেতন, জ্ঞানাশ্রয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণারূপ ও অনন্ত বলে মনে করেন (কৃষ্ণ দাস ৫৬)। আর অনৈক্য হলো নিম্বার্ক মনে করেন জগৎ ঈশ্বরের শক্তির পরিণাম। ঈশ্বরের দেহ নয়। নিম্বার্ক দর্শনানুসারে, ব্রহ্মের সাথে জগতের সম্পর্ক কার্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ। ব্রহ্ম হলেন কারণ আর জগৎ হলো তার কার্য। ব্রহ্ম অংশী আর জীব তাঁর অংশ। ব্রহ্ম হলেন উপাস্য এবং জগত তাঁর উপাসক। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জগত তাঁর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্ম জ্ঞেয় আর জগৎ হলো জ্ঞাতা। তবে বৈষ্ণব ধর্মে নিম্বার্কের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন আছে। নিম্বার্ক ঈশ্বর হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে এবং ঈশ্বরের শক্তি হিসাবে শ্রীরাধিকাকে অনুভব করেছেন। ধর্মতত্ত্বে উপাস্যরূপে শ্রীরাধিকার এই প্রথম আবির্ভাব। নিম্বার্কের মতবাদ পরবর্তীকালে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে'র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভক্তিবাদের তৃতীয় মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে মধ্বাচার্য (১২৩৮ - ১৩১৭) পূর্ববর্তী রামানুজ এবং নিম্বার্ক থেকে প্রায় সম্পূর্ণত স্বতন্ত্র। মধ্বাচার্যের মতবাদের নাম 'দ্বৈতবাদ'। এ মতবাদ অনুসারে পঞ্চভূত দ্বারা ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি সয়ম্ভু। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। যখন ধর্মের ক্ষয় হয় এবং অধর্মের উত্থান ঘটে, তখন ঈশ্বর ধর্ম রক্ষার জন্য অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাই ঈশ্বর এবং জগৎ ভিন্ন। ঈশ্বর নিরাকার নন। তাঁর সুনির্দিষ্ট রূপ আছে। এই মতবাদে ভক্তির যোগ প্রবল। এই মতবাদানুসারে, ঈশ্বর সৎ— তাই তাঁর সত্তা আছে। ঈশ্বর চিৎ— তাই তিনি চৈতন্যময়। ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দময়। ঈশ্বরের সহায় কামনা করলে তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দেন (কৃষ্ণ দাস ৫৬-৭)।

মধ্বাচার্য জোরালোভাবে শঙ্করের মায়াবাদকে খণ্ডন করেছেন। মধ্বাচার্যের মতে, জীবাত্মার সাথে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের যে ভেদ তা নিত্য। এই নিত্যভেদ পাঁচ প্রকার। যথা- ১. ঈশ্বর ও জীবাত্মার ভেদ, ২. জীবাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ, ৩. আত্মা ও জড়ের ভেদ, ৪. ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ এবং ৫. জড় ও জড়ের ভেদ। তাঁর মতে, জগৎ হলো ভেদময়। জ্ঞান, বস্তু, জীব, তত্ত্ব, অনুভূতি, ইন্দ্রিয় সবকিছুই ভেদমূলক। ব্রহ্ম অভেদ কিন্তু জীবাত্মা ভেদযুক্ত। প্রতিটি জীবাত্মা একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। ভেদ আছে বলেই জগৎ সুন্দর ও বৈচিত্রময়। নিম্বার্ক অনুসারীগণের রাধা-কৃষ্ণের বদলে মধ্বাচার্য অনুসারীগণের উপাস্য দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ। এই মতবাদানুসারে, ভক্ত তার ভক্তিগুণে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারলে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের অভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয়। তখনই ভক্তের মোক্ষ বা মুক্তি ঘটে।

বল্লভাচার্যের (১৪৭৮ - ১৫৩১) 'বিশুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ' ভক্তিবাদের চতুর্থ সূত্র। এই সূত্র মতে, জীব ব্রহ্মের অংশ। তাই ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন। জগৎ ঈশ্বরের শরীরে অবস্থিত। ঈশ্বর যদি অগ্নি হন, তবে জগৎ স্ফুলিঙ্গ কণা। ঈশ্বর যদি মণি হন, তবে জগৎ তার জ্যোতি। তাই জগৎ ভ্রম বা অসৎ মায়া নয়। সৎ মায়াকে আশ্রয় করে ঈশ্বর বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। ফলে ঈশ্বর একই সাথে এক এবং বহু। শঙ্করের সাথে বল্লভাচার্যের মতবাদের এখানেই মূল পার্থক্য। বিশুদ্ধ-অদ্বৈতবাদে মোক্ষ বা মুক্তির জন্য ঈশ্বর ভক্তির কোন বিকল্প নেই এবং এই ভক্তি হবে বিশুদ্ধ-ভক্তি। এ ধরনের ভক্তি কর্ম বা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় না, কেবল ঈশ্বরের কৃপাতেই তা মেলে। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদীগণের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ।

পাশ্চাত্য নাটকের বহু-বিভাজন রীতির সাথে একাত্ম নাট্য-রসিকগণের যুক্তির সাথে মধ্বের দ্বৈতবাদী দর্শনের সার কথার মিল রয়েছে। মধ্বের দর্শনে জীবন ও জগতের বহুবিধ বিভাজন বা বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্যের বহু-বিভাজন রীতির মধ্যে নাট্য-আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের সন্ধান লভ্য। ভক্তিবাদের পূর্বতন চারটি সূত্র খণ্ডনপূর্বক শ্রীচৈতন্য তাঁর অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। ধারণা করা যায়, সেলিম আল দীন জ্ঞাতসারেই মধ্বের দ্বৈতবাদ তত্ত্ব পরিহার করেছিলেন। আঙ্গিকের বিভাজন সর্বস্বতার প্রতি না ঝুঁকে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তত্ত্বের মধ্যে তিনি এমন এক উদার ও মুক্ত আঙ্গিকের অন্বেষণ করেছেন যার মধ্যে একাধিক আঙ্গিক একীভূত হতে পারে। অর্থাৎ একটি স্বরূপের ভেতর অনেকগুলো রূপের বিলীন হয়ে যাওয়া। অনেকটা ঘাড়ের গামছার মতো। গা মোছার কাজে লাগে তাই এর নাম গামছা। অথচ গামছাকে মাথার পাগড়ি রূপে ব্যবহার করা যায়, গলা-বন্ধনীর মতো নাক-কান-গলা বাঁধা যায়, চাদরের মতো গায়ে জড়ানো যায়, লুঙ্গি বা নেংটির মতো করে পরা চলে, প্রয়োজনে এর ওপর বসে প্রার্থনার কাজ চালানো যায়, বাজারের থলি, বাঁধার দড়ি, শয্যার চাদর, ছিঁড়ে গেলে ন্যাকড়া, কত বিচিত্র রূপেই না এক গামছাকে লাভ করা যায়।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার ও রূপে প্রকটিত হলেও গামছার শেষ পরিচয়— গামছাই। কারণ এ পরিচয়ের মধ্যেই এর বিচিত্র রূপসমূহ বিলীন হয়। সেলিম আল দীন বলেছেন, "বলা হয়েছে, 'সহস্র বছরের বাঙলা সাহিত্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পশিক্ষাটা একেবারে ভিন্ন'। এতে 'বহুর মধ্যে এককেই যে' আবিস্কার করা হয়েছে তা নয় বরং এই দর্শনের মূল লক্ষ্য হল 'বহুকে' এক 'উৎসকেন্দ্রে' বিলোপ করে দেয়া" (আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী" ৮-৯)। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শিল্পের বহু বিভাজন রীতি খারিজ করে না, বরং আলিঙ্গন করে। আঙ্গিকের শাসনে শিল্পের অবাধ, স্বাধীন, মুক্ত পথ যেন রুদ্ধ না হয়ে যায়; শিল্পীর সৃজনশীলতা যেন আঙ্গিক সর্বস্বতার খপ্পরে আটকা না পড়ে; এমনই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আকাঙ্ক্ষা। তবে এই পরিসরে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণার প্রয়োজন রয়েছে।

শ্রুতি, উপনিষদ, পুরাণসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বৈষ্ণবীয় সারকথার ভিত্তিতে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের যে স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে, তার মূল উপাদান হলো 'ভক্তি'। ভক্তিবাদের গুরুত্ব *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* চমৎকাররূপে বিবৃত আছে। পুরাণের একাধিক স্থানে কর্ম, তপস্যা, জ্ঞানমার্গের চেয়ে ভক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের মতে— কর্ম নয়, জ্ঞান নয়, যোগ নয়, ভগবান প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হলো ভক্তি। এই ভক্তিকে তিনি বলেছেন, 'অহৈতুকী ভক্তি'। হৃদ-মাঝারে আপনা হতে উৎসারিত যে ভক্তিমধ্যে পরমতত্ত্বের সকল জিজ্ঞাসা এবং সকল মুক্তির মীমাংসা আছে, তাই হলো অহৈতুকী ভক্তি। অকুণ্ঠ ভক্তি ও প্রেম দ্বারা প্রভুর কৃপার্জনের মধ্যেই আছে মোক্ষ বা মুক্তি। অর্থাৎ ভক্তিতেই মুক্তি (কবিরাজ গোস্বামী ৪৫২)।

শ্রীচৈতন্য সরাসরি ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু চৈতন্যের সংস্পর্শে এসে অসংখ্য মানুষ বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেছেন। এই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী, রাজপারিষদ, জমিদার, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রমুখ যেমন আছেন, তেমনি নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষও আছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ ৩১)। তবে শ্রীচৈতন্য ধর্ম সংস্কারক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোরতা, নিয়মসর্বস্বতা, সংকীর্ণতা, প্রবল বর্ণ-বিদ্বেষ এবং জাত-পাতের শুচিতার বিরুদ্ধে চৈতন্য শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে হরিনামের মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুফিগণের মতো বৈষ্ণবগণও বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্ক হলো নিত্যপ্রেম সম্পর্ক। হৃদয়মাঝে এই প্রেম নিত্য জাগ্রত রাখার লক্ষ্যেই চৈতন্য নিত্য হরিনাম স্মরণের কথা বলেছেন। সংগীতের তালে দলবদ্ধ হয়ে হরিনাম গাইতেন। যে সংকীর্তন ছিল গৃহাভ্যান্তরের বিষয়, চৈতন্য তাকে খোলা হাওয়ায় বের করলেন। চৈতন্য বলেছেন, "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ," অর্থাৎ "হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" (শহীদুল্লাহ্ ২০৩)। একই দর্শনের প্রতিফলন রয়েছে পবিত্র *কোরআন শরিফে*। উনপঞ্চাশ সংখ্যক 'সুরা হুজুরাতে'র ত্রয়োদশ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ আছে, "ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম"; অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যে অধিক সাবধানী (ধার্মিক), সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন" (রহমান ৩৮৯)। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, "জীবে দয়া, নামে রুচি।" সুফিবাদে এবং ইসলাম ধর্মের হাদিস শরীফে এই মানবতাবাদী বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আছে। "মিশকাতুল মাসাবীহ" এর ৪৯৯৮ সংখ্যক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, "সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিজনের মতো। সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে" ("মিশকাতুল" লাইন ২- ৪)। বহু দেবদেবী

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বন্দিত হিন্দু ধর্মে চৈতন্য একেশ্বরের সন্ধান করেছেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* কৃষ্ণের একেশ্বররূপের সন্ধান মেলে। গীতার 'পুরুষোত্তম-যোগ' নামাঙ্কিত পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে –

> সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে, তা আমারই তেজ বলে জানবে (১৫/১২); আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ধান, যব আদি ওষদি পুষ্ট করছি (১৫/১৩); আমি যঠরাগ্নি রূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি (১৫/১৪); আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ (১৫/১৫)।[৩]
> (প্রভূপাদ ৭৫৭-৬১)

উল্লিখিত বর্ণনায় কৃষ্ণের যে নিখিল বিশ্বের সর্বময় অধিষ্ঠাতা পরিচয় লভ্য, তার সাথে ইসলাম ধর্মের 'আল্লাহ'র স্বরূপের মিল আছে। ইসলাম ধর্মে আছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", অর্থাৎ- "আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই"। পবিত্র *গীতার* 'পুরুষোত্তম-যোগ'-এর উনবিংশ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, "হে ভারত! যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বোতভাবে আমাকে ভজনা করেন"[৪] (প্রভূপাদ ৭৬৬)। আবার 'বিভূতি-যোগ' শিরোনামাঙ্কিত দশম অধ্যায়ের তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, "যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনিই কেবল মানুষদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন"[৫] (প্রভূপাদ ৫৩০)। কৃষ্ণকে একমাত্র ঈশ্বররূপে উপাস্য এবং পূর্ণরূপে জানার ভেতরেই চৈতন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

> বাসুদেবং পরিত্যাজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
> তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতি\

অর্থাৎ- "বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবের উপাসনা যে করে, সেই দুর্মতি তৃষিত হইয়া জাহ্নবী-তীরে কূপ খনন করে" (শহীদুল্লাহ্ ২০২)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমপুরুষ এবং শ্রীরাধিকা হলেন তাঁর শক্তি। ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে প্রধান শক্তি তিনটি, যথা— স্বরূপ শক্তি, জীব শক্তি এবং মায়া শক্তি। শক্তির এই ধারণাটি বিষ্ণুপুরাণ থেকে আত্তীকৃত যেখানে শক্তিকে পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অবিদ্যারূপে উল্লেখ করা হয়েছে (দাশগুপ্ত ৬২)। এই ত্রিবিধ শক্তি ছাড়াও ভগবানের আরেক প্রকার বিশেষ শক্তি আছে, যার নাম অচিন্ত্য শক্তি। মূলত শক্তি মাত্রই অচিন্ত্য। যা কিছু অচিন্তনীয় তাকে গোচরীভূত করানো বা যা কিছু দুর্ঘট তাকে ঘটমান করাই হলো অচিন্ত্যত্ব। বৈষ্ণবগণ বলে থাকেন, "দুর্ঘট-ঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বম", অর্থাৎ- অসম্ভব বা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটনানোর সেই সক্ষমতা যা চিন্তার অতীত। যে শক্তি সম্পর্কে কোন জ্ঞানই তর্কসহ নয়; শুধুমাত্র কার্যফলেই যে শক্তি গোচরীভূত হয়, তার নাম অচিন্ত্য শক্তি। শ্রীচৈতন্যের মতে, "অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশ্যক্যাঃ সন্তি।" ভিন্ন ভিন্ন ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা যা চিন্তা

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

করা যায় না, শুধুমাত্র অর্থাপত্তির দ্বারা যা কেবল জ্ঞানগোচর হয়, তাই অচিন্ত্য (দাশগুপ্ত ২০৪-৫)। শ্রীধর গোস্বামী এবং জীব গোস্বামী অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তির উল্লেখপূর্বক বলেছেন, অগ্নির দাহ্য করার অবর্ণনীয় ক্ষমতাকে অচিন্ত্য রূপে অভিহিত করা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপটি 'সচ্চিদানন্দ' নামে খ্যাত। সচ্চিদানন্দ কথাটির মধ্যে আছে 'সৎ', 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'। এই তিনটি গুণকে আশ্রয় করে ভগবানের স্বরূপ শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী শক্তি হলো সততা বা সত্তাকারী অর্থাৎ এই শক্তির গুণে পরমসত্তা নিজের এবং অপরের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। সংবিৎ হলো বিদ্যাশক্তি। এই শক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের জ্ঞানের আশ্রয় হন এবং সকল জীবকে জ্ঞানের আশ্রয় করে থাকেন। হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা হ্লাদকরূপ ভগবান নিজে হ্লাদিত হন এবং সকলকে হ্লাদিত করেন। এই তিন শক্তির ভেতর গুণোৎকর্ষে সন্ধিনী অপেক্ষা সংবিৎ শ্রেয়তর কারণ সত্তার পরমোৎকর্ষের ফলেই সংবিৎ লব্ধ হয়। আবার সংবিতের চরমোৎকর্ষের ফলে লব্ধ হয় হ্লাদিনী শক্তি। তাই হ্লাদিনী সকল শক্তির উৎকর্ষের সার (রাইন ১৬৯)। হ্লাদিনী শক্তি ভগবৎ-কোটিতে প্রবেশ করে ভগবানকে বিচিত্র লীলারস প্রদান করে রসময় বা হ্লাদিত করে এবং একই সাথে জীবকোটিতে প্রবেশ করে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে জীবকে বিশুদ্ধ আনন্দ দান করে। এই ভগবন্মুখী জীবের বিশুদ্ধ আনন্দের নাম ভক্তি (দাশগুপ্ত ২১১)। ভগবানের মধ্যে হ্লাদিনী রস-রূপিণী এবং ভক্ত হৃদয়ে ভক্তি-রূপিণী হয়ে বিরাজ করে। স্বরূপ শক্তির সারভূতা হ্লাদিনী শক্তির সারঘন প্রমূর্তি হলেন শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকা হলেন নিত্যপ্রেমস্বরূপেরই নিত্য প্রেমস্বরূপিণী (দাশগুপ্ত ২১৫)। পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকার কণামাত্র জীবের ভেতর প্রোথিত হয়ে জীবকে প্রেম-ভক্তির প্রাবল্যে ভাসিয়ে নিতে পারে। শ্রীরাধিকা তাই একই সাথে প্রেমরূপিণী এবং প্রেমদাত্রী (কবিরাজ গোস্বামী ২৮৮)। ভগবৎ-রূপের যেমন কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে সর্বপূর্ণত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, ধামের মধ্যে যেমন বৃন্দাবন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি ভগবৎ-শক্তিরূপে শ্রীরাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ (দাশগুপ্ত ২১৭)। বৃন্দাবনস্থ ভগবানের কৃষ্ণরূপ এবং ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সারঘন নিত্য-বিগ্রহবতী শ্রীরাধিকার প্রেম-পরাকাষ্ঠায় মিলিত যুগলরূপই ভক্তগণের জন্য পরম আরাধ্যবস্তু। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব মতে রাধা ও কৃষ্ণ স্বরূপত এক। আবার এক হয়েও লীলাচ্ছলে পরস্পর ভিন্ন। অচিন্ত্য শক্তিবলে অভেদের মধ্যে লীলাবিলাসে ভেদের কল্পনাই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে আখ্যাত।

পঞ্চদশ শতকের বাংলায় তখন মুসলমান শাসন। ধর্ম ও জাত রক্ষায় জনমানসে একজন অবতারের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল। তৎসময়ে রটে গিয়েছিল যে, ম্লেচ্ছ শাসনকে বিতাড়িত করে একজন ব্রাহ্মণ হবেন গৌড়ের রাজা। এই জন-আকাঙ্ক্ষা এবং দেবোপম চারিত্রিক গুণাবলী ও দেহসৌষ্ঠব শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতাররূপে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীচৈতন্যের অবতাররূপ নিয়ে বৈষ্ণবগণের দুটি মতামত আছে। সনাতন গোস্বামীর মতে চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তিনি শ্রীচৈতন্যকে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-অবতার বলেননি। গোপীগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপে রাধা ব্যাখ্যাত হননি। রাধা শ্রীকৃষ্ণতুল্য বা কৃষ্ণাধিক নন (সেন ২৪৩)। কিন্তু জীব গোস্বামীর মতে চৈতন্য রাধা-কৃষ্ণের সযুজ অবতার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীব গোস্বামীর অনুগামী। জীব গোস্বামীর এরূপ ব্যাখ্যার সূত্র নিহিত আছে রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ-দামোদরের চৈতন্য-ভাবনায়। স্বরূপ-দামোদর তাঁর কড়চায় উল্লেখ করেছেন—

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম \

অর্থাৎ— কৃষ্ণের প্রণয়বিকার রাধা, তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। একাত্ম হইলেও তাঁহারা ভূলোকে (অর্থাৎ ব্রজধামে) পুরাকালে (অর্থাৎ দ্বাপর যুগে) ভিন্ন দেহ লইয়াছিলেন। সেই দুই এক হইয়া এখন চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। রাধার ভাব ও কান্তিমণ্ডিত কৃষ্ণস্বরূপ তাঁহাকে প্রণাম করি (সেন ২৮১)।

কৃষ্ণ হলেন ব্রহ্ম এবং রাধা হলেন পরমাত্মা। তাই রাধা ও কৃষ্ণ অভেদ ও অখণ্ড। বৃন্দাবনে ভিন্ন ভিন্ন দেহে তাঁরা অবিভূর্ত হয়েছিলেন কিন্তু চৈতন্যমধ্যে সেই খণ্ডতা অবলুপ্ত হয়ে তাঁরা অখণ্ড ও অভিন্নরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। চৈতন্যের উপর রাধার রূপারোপের অন্যতম কারণ সম্ভবত তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠব এবং নীলাচলে অবস্থানকালীন সময়ে বিরহিনী রাধার ন্যায় আচরণ (সেন ২৫৫)।

শ্রীচৈতন্যের স্বরূপের ভেতর রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপের একীভূত হওয়া; কৃষ্ণের ভেতর পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার লীন হয়ে যাওয়া; আদ্যাশক্তি রাধার ভেতর মহামায়া, রুক্মিণী, লক্ষ্মীর স্বরূপের সন্নিবেশনসহ প্রভৃতি ধারণাগুলো বাঙালির নৃতত্ত্ব, মানসপ্রবাহ, জীবন-বীক্ষণ, আধ্যাত্ম-ভাবনার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বাঙালি মানসের এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আকাঙ্ক্ষাই বাঙালির শিল্পচিন্তার গতিপথ নির্মাণ করেছে। ফলে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলার শিল্পকলার বিভিন্ন উপাদান পারস্পরিক ভেদ্যতার রীতি পরিহারপূর্বক একটি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্ত্বিক ঐক্য দ্বারা একাঙ্গীকৃত। শিল্পকলা মাত্রই কৃত্যজাত কিন্তু পাশ্চাত্যের ন্যায় বাঙালির শিল্পকলা কখনও কৃত্যকে পরিত্যাগ করেনি। ফলত কৃত্যাশ্রয়ী সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক, সাহিত্যসহ বাঙালির শিল্পকলার এই বহু উপাদানগুলি এক উৎসকেন্দ্রে নিমগ্ন। বাঙালির সাহিত্য থেকে গীত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির সাহিত্য পরিবেশনার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। বাঙালির সাহিত্য গদ্য-পদ্য ভেদের সন্ধান করেনি। বাঙালি মানসের এসকল অন্তর্গত অনুভবই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের স্বরূপ নির্মাণ করেছে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ভাষারীতি বিষয়ে সেলিম আল দীন বলেন, "আমি তাই কথানাট্যের ভাষারীতিতে গদ্য ও পদ্যকে অভেদাত্ম করার প্রয়াসী। আমার ভাষা-চৈতন্যে গদ্য-পদ্যের ভেদ অবলুপ্ত।" (আল দীন, *যৈবতী* ৪)

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের অনুগামী নাট্যরীতির নাম 'বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি' বা 'বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতি'। এখানে 'বর্ণনা' প্রপঞ্চটি শুধু বয়ান বা বিশ্লেষণ অর্থে নয়, বরং এপিক বা মহাকাব্য অর্থে প্রযুক্ত। এরিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্বে ট্যাজেডি এবং মহাকাব্যের পার্থক্য উল্লেখ করতে গিয়ে প্রধান যে উপাদানটিকে চিহ্নিত করেছেন, তা হলো বর্ণনা। অর্থাৎ ট্র্যাজেডি হলো উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বা সংলাপাত্মক এবং মহাকাব্য বর্ণনাত্মক। বর্ণনাসহ মহাকাব্যের অপরাপর বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণপূর্বক বার্টোল্ট ব্রেখট তাঁর

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থিয়েটারকে বলেছেন 'এপিক থিয়েটার'। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাঙালির নাট্যপ্রচেষ্টা যে রীতিতে চর্চিত ও উদযাপিত, তার পরিবেশনারীতির নাম বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি। বর্ণনা বা কথা, ছন্দ, কাব্য, সুর, বাদ্য ও নৃত্য, আখ্যান, তত্ত্বসহ নানাবিধ দ্বৈতাঙ্গিকের সংশ্লেষে লোকায়ত জীবনগন্ধী গল্প বয়ানের মাধ্যমে আবহমান কৃত্যের প্রতিভাসনে বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির অদ্বৈতরূপটি প্রতিষ্ঠিত। বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতি প্রাচীন ওড্রমাগধী রীতিরই উত্তরাধিকার। এ নাট্য রীতি এদেশের পালাকার, গায়েন, কথকগণের একান্ত নিজস্ব নাট্যরীতি।

নিজের দর্শন সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধির লক্ষ্যে শ্রীচৈতন্য পরিকরবৃন্দ সমেত মাঝে মাঝে বিশেষ ধরনের নাটকের অভিনয় করতেন। এ নাটকের নাম 'লীলানাট্য'। এ নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ভগবানের বিভিন্ন লীলা প্রকটিত হয় বলে এর নাম লীলানাট্য। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভেতর লীলানাট্যের প্রসার ঘটেছিল। যে সকল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক অভিপ্রায় অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদকে বিশিষ্ট করেছে, সেই একই সূত্রাবলী লীলানাট্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। লীলানাট্যকে তাই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের নাট্যমূলক ক্রিয়ালীলা বা ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসেবেও অভিহিত করা চলে। বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যের পরিবেশন কৌশল একান্তই লীলানাট্যের অনুরূপ। শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয়, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রায়োগিক কৌশলের জন্যও সেলিম আল দীন শ্রীচৈতন্যের কাছে গভীরভাবে ঋণী।

এমনটি নয় যে, শুধুমাত্র অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের ব্যবহারিক নিরীক্ষার জন্য চৈতন্য লীলানাট্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বরং অন্তর্গত প্রেরণায়, কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্যে, আধ্যাত্মিকতার অমোঘ আকর্ষণে চৈতন্যের প্রায়শই স্বানুভাব জাগ্রত হতো। গভীর তন্ময়তায় নিবিষ্ট হয়ে কখনো নিজেকে কৃষ্ণ, কখনো রাধা, কখনো বিষ্ণুরূপে কল্পনাপূর্বক ভাবাবেশে আচ্ছন্ন থাকতেন। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* সূত্রে জানা যায় যে, একদা তিনি শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণু সেজে গরূড় বাহনরূপী মুরারীর স্কন্ধে চড়ে উঠানময় বিচরণ করেছিলেন। নীলাচলবাসের দিনগুলোতে রাধাভাবে মোহিত হতেন। রাধার বেদনা অনুভব করার জন্য নিজেকে আহত করতেন, রক্তাক্ত হতেন। নৃত্য-গীত-অভিনয়ের প্রতি চৈতন্যের আশৈশব আকর্ষণের কথা জীবনীকারগণ কর্তৃক বিবৃত হয়েছে। নাটগীতে চৈতন্যের দক্ষতা ছিল। ভক্তগণকে সাথে নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করতেন। চৈতন্যের এ নৃত্য পরবর্তীকালে বাংলা-নৃত্যে নতুন মুদ্রার যোগ করেছে। বৈষ্ণবীয় 'উদণ্ড নৃত্য' এবং 'মধুর নৃত্যে'র স্রষ্টা চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরবৃন্দ। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবতে*, জয়ানন্দ রচিত *চৈতন্যমঙ্গলের* 'নদীয়া খণ্ডে', লোচনদাসের *শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে* লীলানাট্য অভিনয়ের বর্ণনা লভ্য। *চৈতন্যভাগবতের* মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে চৈতন্যের লীলানাট্যাভিনয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে, নাটকটি 'অঙ্কের বন্ধনে' পরিবেশিত হয়েছিল অর্থাৎ নাট্য-কাহিনি ছিল একাধিক স্তর বিশিষ্ট। গবেষকের মতে, অন্তত দুটি সুস্পষ্ট খণ্ডে নাটকটি বিভাজিত ছিল (আল দীন, "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" ২৩)।

প্রথম খণ্ডে রুক্মিণী, শিশুপাল, কৃষ্ণের কাহিনি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কৃষ্ণের দানলীলা অভিনীত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এ নাট্যায়োজনে চৈতন্য নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতারূপে অংশগ্রহণ করেন। নির্দেশক হিসাবে শ্রীচৈতন্য নাটকের বিষয়, চরিত্র-বন্টন,

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

পোশাক ও রূপসজ্জা, মঞ্চ পরিকল্পনা প্রভৃতি নির্ধারণ করেন। *চৈতন্যভাগবতের* বর্ণনা অনুযায়ী নির্দেশক চৈতন্য নিম্নবর্ণিত রূপে পরিকরবৃন্দের মাঝে চরিত্র বণ্টন করেন (দাস ১৮৩)।

রুক্মিণী — গদাধর

তালবুড়ী — ব্রহ্মানন্দ

সখী — সুপ্রভাত

বড়াই — নিত্যানন্দ

কোতোয়াল — হরিদাস

নারদ — শ্রীবাস

স্নাতক — শ্রীরাম

মশালধারী শূদ্র বা পাহারাদার — শ্রীমান

প্রধান চরিত্র — গোপীনাথ

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় প্রক্ষেপ থাকতে পরে। গদাধর কর্তৃক রুক্মিণীর চরিত্র চিত্রণের কথা থাকলেও গ্রন্থটির পরবর্তী বর্ণনায় রুক্মিণী চরিত্রে শ্রীচৈতন্য এবং রমার চরিত্রে গদাধরের অভিনয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের দানলীলা পরিবেশনায় চৈতন্য রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেন। সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে চৈতন্য পোশাক ও রূপসজ্জার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। চৈতন্য যথাযথ চরিত্রানুগ সাজসজ্জার অনুরাগী ছিলেন। এমন নিখুঁত সাজসজ্জা চেয়েছিলেন যেন নিজেই তাঁর পরিকরগণকে চিনতে না পারেন (দাস ১৮৩)। নাট্য পরিবেশনার জন্য গৃহ প্রাঙ্গণে 'কথুয়া' বা মোটা কাপড়ের চাঁদোয়া খাটানো হয়েছিল যা মঞ্চসজ্জার ইঙ্গিতবহ। প্রসঙ্গত গবেষক বলেন, "এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে যে, বিশেষভাবে তৈরি কোন মঞ্চের উপরই চাঁদোয়ার আচ্ছাদন দেয়া হয়েছিল। বিশেষভাবে মঞ্চ তৈরির কথা এ জন্য বলা হল যে, চৈতন্যদেব জীবতকালেই অবতাররূপে গৃহীত হয়েছিলেন, সে কারণে তার অভিনয়স্থল বেদী স্বরূপ উচ্চস্থান হবার কথা। সে ক্ষেত্রে (চাঁদোয়ার আকৃতি সচারাচর চৌকোণ হয়ে থাকে) উক্ত মঞ্চ চৌকোণ ছিল এরূপ অনুমানে বাধা নেই" (আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* ১৫৭)। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় 'গৃহান্তরে' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা নেপথ্যগৃহের সমর্থক। বর্ণনানুসারে, গৃহান্তরে সাজসজ্জা গ্রহণপূর্বক শ্রীচৈতন্য রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হন (দাস ১৮৪)। লীলানাট্যের দর্শক সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতে একটি অনুধাবন আছে। এ নাট্য সর্বসাধারণের জন্য নয়। ভক্তিহীন, প্রেমহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত দর্শক হৃদয়ে এর রস নিষ্পত্তি ঘটে না। জিতেন্দ্রিয় ভক্তই কেবল লীলানাট্যের দর্শক হওয়ার যোগ্য। দর্শকের যোগ্যতা সম্পর্কে চৈতন্য বলেছেন—

প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।

দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার \

সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

যে যে জম ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে \ (দাস ১৮৪)

নাটক শুরু হয় মুকুন্দ দাসের কীর্তনের মধ্য দিয়ে। প্রথমে রুক্মিণী বিষয়ক পরিবেশনা। কীর্তনের পর নাটকের পূর্বকথা বিবৃত করার জন্য অদ্ভুত বেশভূষার বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল হরিদাস প্রবেশ করেন। তাঁর মোচড়ানো গোঁফ, মাথায় মহাপাগ, পরণে কৌপীন, হাতে লাঠি। লাঠি নিয়ে দর্শকদের দিকে তেড়ে তেড়ে যান এবং কৃষ্ণনাম বলার জন্য আহবান করেন। হরিদাসের কাণ্ড দেখে দর্শকগণের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। এরপর নারদ বেশে শ্রীবাসের প্রবেশ। নারদের মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি, সমস্ত শরীরে সাদা রঙের ফোঁটা, কাঁধে বীণা, হাতে কমণ্ডুল। লীলানাট্যে চৈতন্য নারদের ধ্রুপদী রূপটিকে গ্রহণ করেননি। তার বদলে মধ্যযুগের লোকনাট্যের জনপ্রিয় ধারায় হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসাবে নারদকে সৃজন করেছিলেন। শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের বিপরীতে চৈতন্যের এ অবদান লীলানাট্যকে নিশ্চয় অভিনবত্ব দান করে। শ্রীবাসের অভিনয় এতোটাই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, তা দেখে শচীমাতা মূর্ছা গিয়েছিলেন। শ্রীবাসের পর রুক্মিণী বেশে বিশ্বম্ভর প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সপ্তশ্লোক পত্র রচনা করেন। রচিত পত্র চৈতন্য কণ্ঠে গীত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু পত্র রচনার অভিনয় কৌশলটি অনিন্দ্য। নয়নের জলকে কালি আর পৃথিবীকে কাগজ কল্পনা করে আঙুল দিয়ে বাতাস কেটে কেটে রুক্মিণী পত্র লেখেন। অনুমিত হয়, রুক্মিণীর পত্র প্রেরণের পর কৃষ্ণ এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং এর ভেতর দিয়ে প্রথম প্রহরের অভিনয়ের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় প্রহরের পরিবেশনাটি ছিল কৃষ্ণের দান-লীলার অভিনয়। গদাধরের নৃত্যের পর 'আদ্যাশক্তি'র বেশে প্রবেশ করেন চৈতন্য। সাথে বড়াই বেশী নিত্যানন্দ। নিখুঁত সাজসজ্জা এবং অপূর্ব অভিনয় গুণে নিত্যানন্দ এবং চৈতন্য দর্শকচিত্তে মুগ্ধতা ছড়ান। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুযায়ী চৈতন্যের নৃত্য ছিল বিস্ময়কর। আদ্যাশক্তি বেশে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে নৃত্যের মাধ্যমে নিজেকে এবং দর্শকগণকে এক গভীর তন্ময়তার আবর্তে স্থাপন করেন। রাধার বেশে তার অভূতপূর্ব নৃত্যে একে একে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন কমলা, সীতা, পার্বতী, ভাগীরথী, মহামায়া। বৃন্দাবনদাস নিম্নরূপে বিবৃত করেছেন—

সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ-গৃহীনী কি জানকী আইলা \
কিবা মহালক্ষ্মী কিবা আইলা পার্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী \
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া \ (দাস ১৮৬)

উল্লিখিত বর্ণনাটি চৈতন্য দর্শন এবং লীলানাট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক-সূত্র আবিষ্কারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যের এ নৃত্য অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রায়োগিক প্রকাশ। বিশ্বনিখিলের প্রকৃতিস্বরূপা যে অদ্যাশক্তির মধ্যে বিরাজ করে সকল মায়া, সকল রূপ, সকল রস, সকল অভিব্যক্তি; সে আদ্যাশক্তির রূপান্তরেই যুগে যুগে বিভিন্ন দেবীরূপের উদ্বোধন ঘটেছে। মৈথুনতত্ত্বের পুরুষ-প্রকৃতি ভাবনার দার্শনিক বিস্তারে যেমন বিভিন্ন দেবোপম স্বরূপের বিবর্ধন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সকল স্বতন্ত্র শক্তি ও অভিব্যক্তি আবার আদ্যাশক্তির স্বরূপমধ্যে লীন। একটি বীজ যেমন বৃক্ষ-শাখা-পত্র-পুষ্প-গন্ধে-রঙে-মাধুর্যে বিকশিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় স্বতন্ত্র-জ্ঞাপক

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

হয়ে ওঠে, তেমনি একটি সবল বৃক্ষের সকল বিরাটত্ব ছোট্ট বীজের মধ্যে লীন হতেও বাধা নেই। রূপান্তরের এই অচিন্ত্যত্বই চৈতন্য দর্শনের সার কথা। আদ্যাশক্তি 'প্রকৃতি' থেকে যেমন লক্ষ্মী, মহামায়া, সীতা, পার্বতী, রুক্মিণী, রাধার বৈবর্তনিক উদ্ভব; তেমনি এসকল দেবাভিব্যক্তির অখণ্ড স্বরূপ হলো আদ্যাশক্তি। চৈতন্য আদ্যাশক্তি রূপে মঞ্চে আবির্ভূত হন এবং নৃত্য এবং অভিনয়ের মাধ্যমে সকল অদ্বৈত শক্তি একে একে উদ্ভাসিত হয়ে পুনরায় চৈতন্য মধ্যে লীনপ্রাপ্ত হয়। অভিনয়ের এই পর্যায়ে স্বানুভাবে আচ্ছন্ন হয়ে নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়েন বলে বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেছেন। সকলে ধরাধরি করে তাকে মঞ্চোপবিষ্ট খাট্টায় উপবেশন করায়। ফলে ধারণা করা যায়, চৈতন্য অভিনীত লীলানট্যে মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা ছিল। এ পরিবেশনায় বাংলা লোকনাট্যের অন্যতম উপাদান 'দোহার'- এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। জগজ্জননী বেশে চৈতন্যের নৃত্যের পর অনুচরগণের গান গাওয়ার প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে—

জগত জননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর \

অনুচর অর্থে পরিকরগণকে নির্দেশ করলেও, এখানে পরিকরগণ দোহারের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন (আল দীন, "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" ২৯)। কারণ নাট্য মধ্যে দোহারগণের কাজ হলো 'সময় উচিত' গীত পরিবেশন করা বা গীতে সঙ্গত প্রদান করা।

নাট্যের অন্তিমকালে বিশ্বম্ভর এক অভূতপূর্ব ঘটনার জন্মদান করেন। আপন বক্ষে ধৃত কৃত্রিম স্তন থেকে উপস্থিত দর্শকগণকে স্তন্য পান করান। ঘটনাটি আদ্যাশক্তির আদিমাতা স্বরূপের উদ্ভাসন। ভক্তি উচ্ছ্বাসে আপ্লুত দর্শকগণ সে কৃত্রিম স্তন্য পানে চৈতন্য-মাঝে জীবনদায়িনী জগজ্জননীর সন্ধান লাভ করেন। এ এমন বিস্ময়কর ঘটনা যে, কৃত্যমূলক পরিবেশনার ভক্তি এবং প্রেমের অদ্বৈত অনুভবে কেবল অনুধাবনযোগ্য। এরপর চৈতন্য ঘোষণা করেন—

সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতামাতা \ (দাস ১৮৮)

এ উচ্চারণ অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ দর্শনেরই সারকথা। চৈতন্য একই সাথে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল অবতার রূপে জীব গোস্বামী ও অপরাপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বন্দিত হয়েছিলেন। চৈতন্যের উচ্চারণটি তাঁর সেই অভেদাত্ম রূপের প্রকাশক। গবেষক সেলিম আল দীন চৈতন্যের এমত বাণীকে শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় ধৃত শ্রীকৃষ্ণের সংলাপের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পিতা হহমস্য জগতো মাতাধাতা পিতামহঃ
বেদং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সমাযজুরের চ \

অর্থাৎ— আমিই এই জগতের পিতা মাতা ও সর্ব প্রাণীর কর্মফল দাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পরিশুদ্ধিকর বস্তু। আমিই ওঙ্কার এবং আমিই ঋকবেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ স্বরূপ (আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* ১৬৯)।

চৈতন্য অভিনীত লীলানাট্যের নৃত্য, গীত, বর্ণনা বা ঘোষণা, সংলাপ, চরিত্রাভিনয়, একজন অভিনেতার একাধিক চরিত্রে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

অভিনয়, একটি চরিত্রের একাধিক চরিত্রে রূপান্তরসহ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বাঙালির কৃত্যে, পালায়, আসরে, উৎসবে-পার্বণে অনুকৃত হয়ে বাঙালির নাট্য-প্রচেষ্টার যে স্বরূপ নির্মাণ করেছে; সেলিম আল দীন তাকে বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় নামে অভিহিত করেছেন। শ্রীচৈতন্যের আদ্যাশক্তি থেকে কমলা, সীতা, পার্বতী, ভাগীরথী, মহামায়ায় উদ্ভাসন এবং পুনরায় আদ্যাশক্তি রূপে প্রত্যাগমনের ঘটনাটির সাথে পালাকার বা গায়েনের একাধিক চরিত্রের রূপায়ন এবং পুনরায় গায়েনরূপে প্রত্যাবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লীলানাট্যের অপরাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন— কথুয়া বা চৌকোণাকৃতি চাদোয়া সম্বলিত প্রায় নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা, সামান্য মঞ্চোপকরণ (খাটিয়া), দোহারগণের উপস্থিতি প্রভৃতি বাংলার লোকজ নাট্য-আঙ্গিকেও প্রতিভাত হয়। রুক্মিণীর পালায় পৃথিবীকে কাগজ এবং আঙুলকে কলম বানিয়ে আঙ্গিক অভিনয়ের আশ্রয়ে গীতাকারে পরিবেশিত চৈতন্যের চিঠি লেখার এই নিরাভরণ দৃশ্যটিও বাংলার পালাকার বা গায়েনের অভিনয়রীতির অনুবর্তী।

পাশ্চাত্যের অভিনয়রীতি চরিত্রের ক্রিয়াশ্রয়ী। অর্থাৎ বাস্তবের অনুকরণমূলক ক্রিয়ার ভিত্তিতে চরিত্রের ক্রিয়া নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলার গায়েন বা কথকের অভিনয়রীতি তদ্রূপ নয়। গায়েন বা কথকগণ গীত এবং নৃত্তের আশ্রয়ে আখ্যান, বর্ণনা বা চরিত্রের ক্রিয়াকে এক প্রকার চলমানতা প্রদান করেন। সেলিম আল দীনের মতে, সুর-ছন্দ-তাল আশ্রয়ী এই অভিনয় ক্রিয়ামূলক নয়, অনেকটা ব্যাখ্যামূলক (আল দীন, *হরগজ* ৩১২)। এ ধরনের অভিনয়কে তিনি বলেছেন, বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক রীতির অভিনয়। এছাড়াও আরো কয়েক ধরনের বর্ণনাত্মক রীতির অভিনয় কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, কখনো কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে গায়েন বা কথক নানা অভিনয়িক হাব-ভাব-ভঙ্গি-কথায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই কৌশলটি সঠিক চরিত্রাভিনয় নয় কিন্তু চরিত্রানুগ। এ ধরনের অভিনয়ে গায়েন বা কথক কখনো হস্তোপচার বা আহার্যের ব্যবহার করে থাকেন, যেমন— চামর, লাঠি, বালিশ, ওড়না ইত্যাদি। আবার জারি, যাত্রা, লীলা, গম্ভীরা প্রভৃতি পরিবেশনায় গায়েন ও দোহারগণ উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিত্তিকে আংশিক চরিত্রাভিনয় রীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতিতে বিশুদ্ধ চরিত্রাভিনয়ও লভ্য, যেমন— সঙ, আধুনিক যাত্রা ইত্যাদি (আল দীন, *হরগজ* ৩১৩)। নৃত্ত, গীত, বাদ্য, কৃত্য, আখ্যানের পাশাপাশি বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ন উপাদান হলো কথা বা বর্ণনা। বর্ণনার মাধ্যমে নাট্য-কাহিনির প্রবহমানতা বজায় থাকে। সেলিম আল দীনের মতে, গায়েনের মুখের সবটুকু বর্ণনাকে যদি একটি সংলাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে তার মধ্যে নানা স্তরে বর্ণনা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সংলাপ, গীত প্রভৃতি মিশে থাকে। বর্ণনার সময় গায়েন বা কথক যদি সংলাপে প্রবেশ করেন, তবে বর্ণনার ঢং থেকে সাধারণত বিচ্যুত হন না। অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংলাপও বর্ণনা প্রবাহের কারণে পরোক্ষ সংলাপে রূপান্তরিত হতে পরে। সেলিম আল দীনের মতে, বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয়ে গায়েন বা কথক বর্ণনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিন ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেন, যথা— বিশুদ্ধ বর্ণনা, সংলাপকে নিষ্ক্রিয় করে বলা এবং প্রত্যক্ষ সংলাপ (আল দীন, *হরগজ* ৩১৩)।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মূখ্যত লৌকিক ধারার শিল্পকে আশ্রয় করে বিবৃত হয়েছে। তবে গীতগোবিন্দ বা অপরাপর দরবারী শিল্পচর্চাও এ রীতির বাইরে নয়। উল্লেখ্য বাঙালির নন্দন-ভাবনা শিল্পের ধ্রুপদী রূপের প্রতি তেমন ধাবিত হয়নি। প্রাক-বুদ্ধকাল

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থেকে উনিশ শতক অবধি বাঙালির নন্দন ভাবনার এই মূলধারাটি ইতোপূর্বে সংজ্ঞা বা সূত্রাকারে ব্যাখ্যাত হয়নি। কারণ কৃত্য এবং আধ্যাত্মবাদের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা বাঙালির শিল্পতত্ত্বকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পড়েনি। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক অভিঘাতে নিজস্ব শিল্পরীতির প্রতি পরাঙ্মুখ-প্রবণ শহুরে বাঙালি বিলেতি সংস্কৃতিকে আপন ভাবতে শুরু করলে, বাঙালির সত্যিকারের নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রটিকে উদ্ঘাটন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল বলে সেলিম আল দীন মনে করেন। তাঁর মতে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের আবেদন শুধুমাত্র শৈল্পিক পরিভাষা বা আঙ্গিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একটি জাতির নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয়ের সাথে যুক্ত। বাঙালির নিজস্ব শিল্পতত্ত্ব নেই— এই ঔপনিবেশিক শ্লেষের বিরুদ্ধে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এক ধরনের প্রতিবাদও।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

টীকা:

১. বজ্রধর নাচেন, দেবী গান গীত

বুদ্ধের নাটকের বিষম এই রীত \ (সেন ৬৭-৮)।

২. তাঁত বেচিস ডোম্নী আর (তো) চাঙ্গাড়ি

তোর কারণে (আমি) ছাড়ি নটগিরি। (সেন ৬৩-৪)।

৩. যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ \ (১৫/১২)

গমাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বা সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ \ (১৫/১৩)

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমাযুক্ত পচাম্যন্নং চতুর্বিধম \ (১৫/১৪)

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ \" (১৫/১৫) (প্রভুপাদ ৭৫৭-৬১)।

৪. যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত \ (১৫/১৯) (প্রভুপাদ ৭৬৬)।

৫. যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে \ (১০/৩) (প্রভুপাদ ৫৩০)।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তথ্যসূত্র

আল দীন, সেলিম। "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর", *থিয়েটার স্টাডিজ,* ৩য় সংখ্যা, (সম্পা.) সেলিম আল দীন, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫, পৃ. ৭ - ৪০।

---। "কথাপুচ্ছ।" *যৈবতী কন্যার মন,* গ্রন্থিক, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৪০ – ১৪৩।

---। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

---। *বাঙলা নাট্যকোষ*। *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র - ৫,* (সম্পা.) সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭ – ৩০৪।

---। "শ্রীচৈতন্যভাগবতে' নাট্যপ্রসঙ্গ", *থিয়েটার স্টাডিজ,* ১ম সংখ্যা, (সম্পা.) সেলিম আল দীন, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ. ৭ - ৩৭।

---। "কথাপুচ্ছ", *হরগজ। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র - ৫,* (সম্পা.) সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১১ – ৩১৬।

কবিরাজ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* । (সম্পা.) শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৮।

কৃষ্ণ দাস, জীবন, সম্পাদক। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব* । আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০২২।

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার নবজাগৃতি* । ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫।

দাশগুপ্ত, শ্রীশশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ* । এ মুখাজী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৯।

দাস, বৃন্দাবন। *চৈতন্যভাগবত* । (সম্পা.) সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯১।

প্রভূপাদ, স্বামী, সম্পাদক। *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (যথাযথ)। (অনূ.) ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মুম্বাই, ১৯৮৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। বইপত্র, ঢাকা, ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, সম্পাদক। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* (২য় খণ্ড)। (অনূ.) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *চৈতন্যদেব* । প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১৯।

মজুমদার, অতীন্দ্র। *চর্যাপদ* । সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০২২।

"মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)।" পর্ব-২৫, শিষ্টাচার। *বাংলা হাদিস*। https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75722।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, অনূবাদক। *কোরানশরিফ* । মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬।

রাইন, রায়হান। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তিবাদ।" *বাংলার ধর্ম ও দর্শন,* (সম্পা.) রায়হান রাইন, সংবেদ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৭ – ২৮২।

রায়, নীহারঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৪০০।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী। *উপনিষদ: প্রথম ভাগ* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯।

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। *বাংলা সাহিত্যের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড)। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০২০।

---। *বাউলতত্ত্ব* । পড়ুয়া, ঢাকা, ২০০৩।

---। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* । মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।

---। "চৈতন্য মতবাদ ও ইসলাম।" *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, (সম্পা.) রায়হান রাইন, সংবেদ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৬৩ – ১৮১।

সান্যাল, অরুণ। *বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ* । প্রতিভা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৫।

সেন, শ্রীসুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯১।অ

Konow, Sten. *The Indian Drama*, (Trans.) Dr. S. N. Ghosal, General Printer & Publishers, Calcutta, 1969, P. 79-80.